গুপ্তবিদ্যা

মনীষ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

যেটা লিখতে যাচ্ছি সেটাকে ভূমিকা না বলে কৈফিয়ৎ বলাই ভালো। কার কাছে সে কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করলে, আমার উত্তর হবে— যে পাঠক আমাকে আজ এতোটা ভালোবাসা আর সম্মান দিয়েছে তাদের কাছে। দীর্ঘদিন চলতে থাকা মহামারি, তার প্রভাবে লকডাউন, মানসিকভাবে আর সকলের মত আমাকেও পিছিয়ে দিয়েছে। যা লিখি তাই মুছে ফেলি। ল্যাপটপের অন্যান্য বোতামের থেকে ব্যাকস্পেস কাজ করে বেশি। কিছুই লিখতে যেন আর ভালো লাগছিল না। ওদিকে কোভিডের পরবর্তী ঢেউ চলে এসেছিল। আমি পরিবারের সকলকে নিয়ে পড়লাম মহা বিপদে। লেখালেখি হয়ে গেল পুরোপুরি বন্ধ। ২০২১ এর পয়লা বৈশাখের পরে কাজ করার ইচ্ছেটাই চলে গেছিল। তার ওপর চোখে পড়ছিল এনকারেজ করার চেয়ে মন ভেঙে দেওয়ার লোক বেশি আমাদের চারিপাশে। প্রকাশকের তরফ থেকে লেখা চাওয়া হলেও আমি দিতে পারছিলাম না। কাজেই বইমেলার লেখা নিয়ে বসি কিন্তু লেখা আর হয় না। তখন মাথায় একটা প্লট এল। জুডাসের সেই অভিশপ্ত কয়েন যদি আমাদের দেশে আসে কোনভাবে! লিখে ফেললাম একটা বড় গল্প। কালোবাজারি, গুণ্ডারাজত্ব, আরও নানান হ্যানত্যান জিনিস মিশিয়ে বেশ একটা গল্প দাঁড়িয়েও গেল। অলৌকিক ঘরানার এই গল্পটা লেখার পরে ব্যস আবার ল্যাপটপে বোতাম টেপা একেবারে বন্ধ।

অবস্থা যখন এমন দাঁড়িয়েছে কী করা যাবে না যাবে। আর কিছু আদৌ লেখা যাবে কি না! সেই সময় বেঙ্গল ট্রয়কার এক কর্ণধারের সঙ্গে কথা হল একটা পুরোনো প্লট নিয়ে। ও বলল একটা ছোট্ট উপন্যাস দিলেও হবে। মাথায় এলো আর একটা গল্প। যে ভাবনা জীবনেও ভাবিনি তেমনই একটা কাজ করে বসলাম। থানা, পুলিশ, খুন, খুনি, রক্তারক্তি এসব সাজিয়ে ফেললাম গল্প বলার জন্য। মূল বিষয় কিন্তু ভিন্ন। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে জ্যোতিষ শাস্ত্র। এর বেশি আর কিছু বললাম না।

এই বইতে একটি উপন্যাসিকা এবং একটি বড়গল্প থাকছে আমার পাঠকদের জন্য। দড়কচা মারা ছোট লেখা অনেকেই পছন্দ করেন না, তাদের উদ্দেশে একটাই কথা বলার—বইটা এড়িয়ে যেতে পারেন। কারণ, সময়কে কাজে লাগিয়ে বড় লেখা লেখার মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। গল্পে কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে, আশা করি পাঠক আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এই জন্য। এরও একটা কারণ আছে, এই দুটো লেখাই আমি লিখেছি ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে। সেই সময় থেকে চোখে এসেছিল একটা বড় সমস্যা। লিখতে গিয়ে কিছুটা টাইপ করেছি, কিছুটা ভয়েস টাইপ করেছি, তাতে কোথাও কোথাও সমস্যা থাকলেও থাকতে পারে।

সবশেষে বলব দুটো থ্রিলার লেখার চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠক আগের মতোই ভালোবাসা দেবে। সবাই ভালো থাকবেন, বই পড়বেন।

মনীষ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা

গুপ্তবিদ্যা ৯
জুডাস কয়েন ৯১

গুপ্তবিদ্যা

১

ময়ূর কুমারের ঘুমটা ঝপ করে ভেঙে যায় ঠিক রাত তিনটের সময়। ঘটনা যে একদিন দুদিনের তা নয়। এটা প্রায় রোজ হয়। সন্ধে হলেই বাংলার বোতল খোলা, তারপর রাত দশটা অবধি চলে রোজের খোরাক। সেই পর্ব শেষ হলে কোনোমতে দুটো রুটি আর এক প্লেট তড়কা খেয়ে দড়ির খাটিয়ায় ঘুম। আর ঠিক রাত তিনটে বাজতে না বাজতেই একটা বাজে স্বপ্ন দেখে ঝপ করে চোখ খুলে যাওয়া। একটুও ঘুম থাকে না আর। আবার চারটে নাগাদ চোখ জুড়িয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দারের ডাক শোনা যায়, 'এ শালা হারামখোর, উঠ বে জলদি। গাড়ি নিকলনে কা টাইম হো গ্যায়া তো।'

লরি তো আর এক জায়গায় থেমে থাকার জিনিস না। কখনো সারারাত আবার কখনো সারাদিন কোথাও না কোথাও চলেই চলেছে মাল নিয়ে। সর্দার ময়ূরকে খুঁজে পেয়েছিল গুয়াহাটির পান বাজারে। সেখানে একটা ভাতের হোটেলে ময়ূর তখন কাজ করত। ওর হাবভাব ছিল একটু মেয়েলি। কিন্তু ওর যে গুণটা সর্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটা হল খাটার ক্ষমতা। ময়ূর অনায়াসেই কয়েকমণ ওজনের জিনিস কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। মেয়েলি ময়ূরকে সঙ্গে

রেখে দিয়েছিল সর্দার। হাতে ধরে গাড়ির কাজ শিখিয়েছিল। এখন হেল্পারের কাজ করছে ও। সর্দারের পাল্লায় পড়ে মদ খাওয়াটাও শিখেছিল খুব তাড়াতাড়ি। তারপর থেকে প্রতি রাতেই ও আর সর্দার বসে পড়ে সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। আজও যেমন বসেছিল। নেশাও হয়েছিল ভালোই। কিন্তু এই এক ঝামেলা। রাত তিনটের সময় ঘুম ভাঙবেই।

চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ময়ূর শুনতে পেল কোথাও একটা ট্রেন যাচ্ছে ধাতব শব্দ তুলে। ওর মনে পড়ল কাল বিকেলে ওরা থেমেছিল একটা বড় পেট্রল পাম্পের পাশে। সেই পাম্প সংলগ্ন একটা কাঁটা কলে গাড়ির ওজন করেছিল সর্দার। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি থেকে ওদের এখানেই থাকতে বলা হয়েছিল। ভোর ভোর শহরে ঢুকে মাল নামিয়ে আবার বেরিয়ে যেতে হবে। বিশেষ কোনো কাজ না থাকায় সর্দার আর ময়ূর বসেছিল বোতল সাজিয়ে। তারপর কখন যে খেয়েছিল আর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই।

ট্রেনটা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তলপেটে একটা চাপ অনুভব করল ময়ূর। পেচ্ছাপের বেগ এসেছে। না গেলেই নয়। নেশা কেটে গেছে আপন নিয়মে। লরির মাচা থেমে নেমে এল ও। লুঙ্গিটায় একটা কোঁচা মেরে এগিয়ে গেল রেললাইনের দিকে। জায়গাটা আগাছায় ভর্তি। কোথাও কোথাও ঝোপ এতটাই ঘন, যে মাটি দেখা যায় না। বাঁ হাত দিয়ে একটা ঝোপ সরিয়ে ময়ূর সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ও রেললাইনের একেবারে কাছে চলে এসেছে। জায়গাটা ফাঁকা, একেবারে ধু ধু প্রান্তর। বেশ নিঝুমও।

পেচ্ছাপ করতে করতে একটা আরামের শব্দ বেরিয়ে এল ময়ূরের মুখ দিয়ে। ঠিক তখনই ওর পায়ে কিছু একটা

ঠেকল। ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ লাগল যেন। ভয় করল ওর। সাপ নাকি! আলো না নিয়ে এই অন্ধকারে আসা ঠিক হয়নি। নিচের দিকে তাকাল ও। আর তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই ওর গলা চিরে বেরিয়ে এল একটা বিকট আর্তনাদ, "সর্দারজি..."

ময়ূরের চিৎকার এতটাই জোরালো ছিল যে সর্দার ছাড়াও অন্যান্য লরি ড্রাইভারদের ঘুমও ভেঙে গেল। সবাই একসঙ্গে দৌড়ে গেল শব্দের উৎস বরাবর ঝোপটার দিকে। দেখতে পেল ময়ূর মাটিতে পড়ে আছে। আর ওর ঠিক পাশেই যা পড়ে আছে তা দেখে সকলেই চোখ বাইরে বেরিয়ে এল আতঙ্কে।

মাটিতে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ। হাত, পা, মাথা সব আলাদা আলাদা করে কেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে লাশটার। কাটা মাথাটার কপালে কেউ তিলক এঁকে দিয়েছে চওড়া করে। কাটা মাথাটার চোখ দুটো খোলা, সেই প্রাণহীন চোখে যেন সারা পৃথিবীর ভয় আর বিস্ময়।

২

দক্ষিণেশ্বরের রেললাইনের পাশে যে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া মৃতদেহটা পাওয়া গেছে সেটার পাশে পড়েছিল একটা নোট। ছেঁড়া একটা কাগজে লেখা ছিল—

অরুণ আর অঙ্কে মিলিয়েছে হাত।
খোঁড়া তার তিন ঘর আগে।
শিশুর সাথে চাঁদের যেদিন দেখা হবে।
আবার কোনো হারামির গলা কাটা যাবে...

বলরাম চ্যাটার্জি চুলকে চুলকে চকচকে টাকটা সাদা

করে ফেলেছেন, কিন্তু এই নোটে লেখা কথাগুলোর মানে কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না। ধরা যাক, অরুণ আর কোনো একটা অন্ধ লোক হাত মিলিয়েছে। মানে এক্ষেত্রে হত্যাকারী দুজন। কোনো কারণে ঝামেলা হয়েছে ভিকটিমের সঙ্গে মার্ডারারদের, নামিয়ে দিয়েছে বডি। এ শালা ইংরাজি সিনেমা নাকি! "ধুত্তেরি"। বিরক্ত মুখে ফাইলটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন থানার বড়বাবুটি। খোঁড়া তার তিন ঘর আগে— কথাটার মানে কী! শিশুর সঙ্গে চাঁদের দেখা হবে... কী যন্ত্রণা রে বাবা, এ কি আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা নাকি! আর শেষ লাইনটা আবার বেশ ভয়ংকর। সেখানে আবার কারো খুনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

"মে আই কাম ইন?"

গুরুগম্ভীর একটা গলার স্বরে ঘোর ভাঙল বলরাম চ্যাটার্জির। চশমাটা নাকের ডগায় ভালো করে এঁটে তিনি দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একজন সুদর্শন পুরুষ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তামাটে গায়ের রঙ, লম্বাটে মুখ আর চোখা নাকের নিচে একজোড়া চওড়া গোঁফে ছেলেটিকে বেশ মানিয়েছে।

বলরাম বাবু হাত নেড়ে বললেন, "আসুন।"

ছেলেটি ঘরে ঢুকে পকেট থেকে একটা আই-কার্ড বের করে বলরাম বাবুর টেবিলের ওপর রাখল।

সেটা তুলে একবার চোখ বুলিয়েই ওঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "আরে, স্পেশাল ব্রাঞ্চ! বসুন বসুন। বাপ রে! পোস্টমর্টেম হতে পারল না ডিপার্টমেন্ট স্পেশাল অফিসার পাঠিয়ে দিল। মনে হচ্ছে এই কেসটা বেশ গুরুতর!"

ছেলেটি সুন্দর করে হাসল। তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে

বলল, "গত মাসের প্রথম দিকে কলকাতার রেস-কোর্সের সামনে একজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ভোরবেলা এক চা-ওয়ালা বডিটা দেখতে পেয়ে পুলিশ ডাকে। যদিও কালকের মতো ব্রুটালি খুনটা করা হয়নি। কিন্তু সেখানেও একটা নোট পাওয়া গেছিল, যার বয়ান ভীষণ অদ্ভুত ছিল। আমার সিনিয়র আমাকে বললেন, কালকের বডিটার পাশেও তেমনই একটা নোট পাওয়া গেছে। ওটা কি একটু দেখা যায়?"

বলরাম চ্যাটার্জি টেবিল থেকে ফাইলটা তুলে এগিয়ে দিলেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারটির হাতে। সে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে নোটটা পড়ল। তারপর ভুরু কুঁচকে তাকাল বলরামবাবুর দিকে। বলল, "ঠিক তাই। এখানেও খুনি চার লাইনের লেখা দিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না ঘটনাগুলো নিয়ে। আর একজনই করছে এগুলো।"

"আগের খুনটার পাশে যে নোটটা পাওয়া গেছিল সেটাতে কী লেখা ছিল?" চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন বলরাম চ্যাটার্জি।

নবীন অফিসারটি পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজ বের করে এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। বলল, "ওটা আমি টুকে নিয়েছিলাম ফাইল থেকে।"

কাগজের লেখাটা দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল বলরাম চ্যাটার্জির। কাগজে লেখা আছে—

শুরু হবে কাজ।
গুরু ছাড়বে কাঁকড়াবিছের ল্যাজ।
মানুষ ঠকাস যারা সব মর।
আবার দেখা হবে সেদিন অরুণ আর অন্ধর,
তারপর শুধু খণ্ড আর খণ্ড

যুদ্ধের। এই কারণ দেখিয়ে ইরাক ধীরে ধীরে ইরানের ভূমির ওপর কব্জা করতে শুরু করে। কিন্তু আসল কারণ ছিল অন্য। ইরাক শাতিল নদীর মোহনা নিজেদের অধিকারে নিতে চেয়েছিল। ওরা তিনটে দ্বীপও দখল করে নেয়। এছাড়াও ইরানের খুজেস্থান প্রদেশকে দখল করে নেওয়া এবং আরও অনেক স্বার্থের খেলা ছিল।

"ওই দুই দেশের যুদ্ধের সুযোগ নিচ্ছিল সারা পৃথিবীর মাফিয়া মহল। যুদ্ধের আড়ালে স্মাগলিং আর কালোবাজারির অন্ধকার জগত যেন নতুন যুগের সূচনার আভাস পাচ্ছিল। সেই সময়ে বসে ছিল না আমাদের দেশের অন্ধকারের কারবারিরাও। যত অন্ধকারের জিনিসপত্র সাপ্লাই হতে শুরু করল বিনা বাধায়। এই সময়ে এই দেশের সাপ্লায়াররা একটা নতুন ধান্দা শুরু করে। ভিখারির ব্যবসা। এর আগে মোটামুটি ভিখারিরা পেটের দায়ে ভিক্ষা করত, কিন্তু এই আটের দশকে একদল মানুষ তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। তেমনই এক ভিখারির কাছে একদিন একটা আশ্চর্য জিনিস এসে পৌঁছায়।"

গল্পের এই পর্যায় থেমে গেলেন রামপ্রসাদদা। কী যেন ভাবলেন মাথা নিচু করে। তারপর খুব ধীরে সুস্থে বললেন, "এই গল্পের অনেক চরিত্র আছে। সেসব চরিত্ররা নানা ধরনের। শুনতে কিন্তু একটু সময় লাগবে।"

আমরাও সমস্বরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলাম, "সময় লাগে লাগুক। আমাদের কি সময়ের অভাব পড়েছে নাকি?"

রামপ্রসাদদা শুরু করলেন, "চুরাশি সালে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায় ভারতবর্ষে। সেটা ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা। এর আগে মোটামুটি কালোবাজারির ব্যবসাটা খুব সাবধানে

চলত। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী মারা যাওয়ার পরেই বাংলা আর বিহারের অন্ধকার জগৎ খুবই সক্রিয় হয়ে উঠল। মুকুন্দ দাস নামের একজন ক্ষমতাশালী মাফিয়া লিডার বাংলা আর বিহারের স্মাগলিং-এর র‍্যাকেটটাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে শুরু করেছিল। ওদিকে নেপাল আর এদিকে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মালপত্র ঢুকতে শুরু করল এদেশে কোনো ঝামেলা ছাড়াই। এই মুকুন্দ দাস বিভিন্ন অঞ্চলে গুন্ডা পুষতে শুরু করল। এই গুন্ডাদের অধিকাংশই চালাত ভিখিরিদের নিয়ে কালোবাজারিদের ব্যবসা। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দিনের আলোয় সেসব ভিখিরির দল মাল পৌঁছে দিত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

"মুকুন্দ দাস প্রধানত রঙপুর থেকে আলিপুরদুয়ার হয়ে জঙ্গলের রাস্তায় স্মাগলিং-এর মাল আনা নেওয়া করত। কুচবিহার আর পাকুরে সে ফেঁদে বসেছিল বড় আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা। ওপর ওপর অবশ্য দেখে কিছুই বোঝার উপায় ছিল না। মুকুন্দকে মাল দিত বাংলাদেশের এজেন্ট আজমল হোসেন। আর মুকুন্দ সেই মাল কলকাতায় পাঠাতে হলে সাহায্য নিত মনোজ ভাই নামের এক গুন্ডার। মনোজ একদিকে চালাত গুন্ডাবাজি, বলপূর্বক টাকা উসুল আর চুরি ছিনতাইয়ের কারবার আর অন্যদিকে ভিখিরি খাটিয়ে পয়সা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে চলত সেই ভিখিরিদের দিয়ে মাল পাচার করার কাজ।

"ঘটনাটা ঘটল নব্বই সালের আগস্ট মাসে। স্বাধীনতা দিবসের পরে পরেই একরাতে মুকুন্দর পেটে শুরু হল অসহ্য যন্ত্রণা। সেই সময়ে সে ছিল পাকুড়ে। পাকুড় থেকে ধুলিয়ানে এক ডাক্তারকে দেখাতে গেলে জানা গেল, মুকুন্দর কলকাতায়

চিকিৎসা করতে যেতে হবে। ধুলিয়ানের ডাক্তার লক্ষণ ভালো বুঝলেন না। কলকাতায় এসে পরীক্ষা করে জানা গেল, মুকুন্দর পেটে ক্যানসার হয়েছে এবং দ্রুত সমস্যাটা বেড়ে চলেছে। বাঁচার আশা প্রায় নেই বললেই চলে। একমাস আগেই লোকটা অনেক টাকা মুনাফা করেছে একটা কাজ করে। আর একমাস পরেই এই অবস্থা। লোকটার অজান্তেই শরীরে ঢুকে পড়েছে কর্কটের মতো ভয়ঙ্কর রোগ। বিষয়টা শুনে চমকে গেল আজমল হোসেন। সে তখন রাজশাহীতে। পার্টনারের এই অবস্থা শুনে সে ছুটে এল ভারতে। এখান থেকেই শুরু এই গল্পের।"

রামপ্রসাদদার চোখ জ্বলজ্বল করছে। কত কী-ই যে তিনি ভাবছেন আমি আর বিশ্বজিৎ কিছুই বুঝতে পারলাম না। দুপুর হয়ে আসছিল। আমরাও এখন না উঠতে পারলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। গল্প শোনার আগে তো বলে ফেলেছি, আমাদের কোনো তাড়া নেই, ওদিকে এটুকু শুনতেই যে দুপুর হয়ে যাবে কে জানত!

বিশ্বজিৎ আমতা আমতা করে বলল, "এখনও গল্পটা শুরুই হয়নি রামদা?"

রামপ্রসাদদা হাসিমুখে বললেন, "ব্যস্ত হোস নি। আজ নয় এখানেই দুটো ভাত খেয়ে যাস। বাড়িতে যদি শোনে তোরা আমার এখানে আছিস, আশা করি কেউ কিছুই বলবে না।"

আমরা জানি, রামপ্রসাদদার বাড়িতে আছি জানলে সত্যিই আমাদের বাড়িতে কেউ কিছু বলবে না। এই ভদ্রলোকের একটা আলাদা জায়গা আছে আমাদের মনে এবং আমাদের বাড়ির বড়রাও ওঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। আমারা মাথা

নাড়লাম, আমরা বাড়ি ফেরার ব্যাপারে আর চিন্তা করছি না।

রামপ্রসাদদা অমলদাকে আমাদের খাওয়ার কথা বলে আবার গল্পে মন দিলেন।

উনি আবার শুরু করলেন, "হান্নান ছিল জন্মান্ধ। কোনমতে ভিক্ষা করে দিন চলে যায় তার। ভিক্ষা করে যেটুকু উপার্জন হয়, বেশিরভাগটাই দিয়ে দিতে হয় মনোজভাইকে। মনোজভাই ছিল সেই এলাকার গুন্ডা। এই মনোজের কথাই একটু আগে বলেছি তোদের। হাসতে হাসতে সে নাকি মানুষের গলা নামিয়ে দিতে পারত, ল্যাংড়া হরির কাছে শুনেছে হান্নান। টাকা উসুল করা ছাড়াও লোকটার একটা বড় ধান্দা হল ভিখিরি খাটানো।

"হান্নানের মতো আরও দশ বারোজন ভিখিরি মনোজের হয়ে কাজ করত। সুরমাদেবী ক্যান্সার ট্রাস্টের সামনে বসে ভিক্ষা করলে অনেক টাকা আয় হত ভিখিরিদের। তাই ওই অঞ্চলটাকেই ভিখিরি খাটানোর আদর্শ জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিল কুখ্যাত মনোজ। নানা জাতের ভিখিরি ছিল তার দলে। কেউ চোখে দেখত না, কেউ বা আবার কাটা পা নিয়ে বসে থাকত পথের ধারে। আবার অনেকে ছিল যারা মনোজভাইয়ের কৃপায় নকল সার্টিফিকেট বের করে মা অসুস্থ অথবা ছেলের অপারেশন হবে এই মর্মে টাকা সংগ্রহ করত। ভিখিরিদের ভিক্ষা চাওয়াও যে একরকমের ব্যবসা তা এই মনোজভাইয়ের পাল্লায় না পড়লে জানতেই পারত না হান্নান। দিনের শেষে রোজগার মন্দ হত না। রুগী দেখতে এসে তাঁদের বাড়ির লোকজন পার্স খুললেই চারআনা, আটআনা এমনকি দু-পাঁচ টাকাও বের ক'রে দিত বিনা সংকোচে। ভিখিরিদের আশীর্বাদে যদি তাদের বাড়ির

মানুষটা সেরে উঠে বাড়ি ফিরতে পারে সেও কি কম পাওয়া! রাতে হান্নানেরা যখন হিসেব মেলাতে বসত, দেখা যেত এক একজনের কাছে পাঁচশ থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশ পাওয়া যাচ্ছে। নব্বই সালে সেটা টাকার অঙ্কে মন্দ ছিল না।

"যেদিনের কথা বলছি সেদিনই একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন একটু চুপচাপ থাকতে বলেছিল মনোজ তার ভিখিরি ব্যাটালিয়নকে। তার বস ভর্তি হয়েছেন নাকি সুরমাদেবী ট্রাস্টে। মনোজ হান্নানদের উদ্দেশ্য করে কঠিন গলায় বলেছিল, ভাইসব আজ যেন কেউ গলা দিয়ে একটাও আওয়াজ না বের করে। আজ মুকুন্দ স্যার ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। উনি আমাদের ধান্দার মাইবাপ। সারাদিন এখানে ওঁর লোকেদের আনাগোনা থাকবে। তোরা যদি 'ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও' করে চিল্লেছিস, তো গলা নামিয়ে দেব। কেউ খুশি হয়ে যদি তোদের থালায় দু-দশ টাকা ফেলে যায় তাহলে অবশ্য অন্য কথা...

"হান্নানের মতো আরও অনেকেই মাথা ঘামায়নি এ ব্যাপারে। কে মুকুন্দ স্যার জানতেও চায়নি। ওরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে ওদের কী দরকার! অন্ধ হান্নান এটুকু শুধু বুঝতে পেরেছিল, আজ হাসপাতাল চত্বরে অন্যদিনের চেয়ে লোক অনেক বেশি। মাঝে মাঝেই ওর ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় টুং টাং শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ও। সন্ধের পরে নাটা এসে গুনে দিয়েছিল হান্নানের টাকাপয়সা। তারপর খ্যাঁক করে হেসে বলেছিল, 'আরে মামা আজ তো তুমি বড়লোক!'

বিরক্ত হয়ে একটা খারাপ কথা বলেছিল হান্নান। 'বড়লোক আবার কোন ফুইন্নির পুত? যা আছে সবই তো মনোজ মাজি